গাজীউল হক

যার হাত ধরে এসেছে কথা বলার অধিকার

সংশপ্তক হাসান

যাদের হাত ধরে এসেছে ভাষার অধিকার। যারা তাজা বুলেটের সামনে বুক পেতে এনেছেন রাষ্ট্রভাষা বাংলা, তাদের মধ্যে অন্যতম গাজীউল হক। যিনি শুধু ভাষা সৈনিকই নন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধেও গড়ে তুলেছিলেন সশস্ত্র প্রতিরোধ।

জন্ম, বেড়ে ওঠা

১৯২৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার নিচিন্তা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন গাজীউল হক। পরিবার ছিল রাজনীতি সচেতন। বাবা মওলানা সিরাজুল হক সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন কংগ্রেস ও খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে। মায়ের নাম নূরজাহান বেগম। গাজীউল হকের পড়াশুনা শুরু মক্তব থেকে। পরে ভর্তি হন কাশিপুর স্কুলে। ছোট বয়সেই মেধার স্বাক্ষর রাখেন গাজিউল। প্রাথমিকে বৃত্তি লাভ করেন।

দেশপ্রেমের শেকড়

প্রাথমিকের গণ্ডি পেরিয়ে ১৯৪১ সালে গাজীউল নাম লেখান বগুড়া জেলা স্কুলে। এই স্কুল গাজিউল হকের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তার ভেতরে রাজনৈতিক সচেতনতা ও দেশপ্রেমিক সত্তার ভিত রচনা করেন স্কুলটির শিক্ষক সুরেন বাবু। তার সংস্পর্শে এসে দেশপ্রেম নামের চারা গাছটি রোপিত গাজীউলের মস্তিষ্কে। যা ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় পালন করে দেবদারুর ভূমিকা। বগুড়া জিলা স্কুল থেকে মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোন প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে। এরপর গাজীউল ভর্তি হন আজিজুল হক কলেজে। বগুড়া জিলা স্কুলে দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক সচেতনতার যে চারাটি রোপিত হয়েছিল গাজীউলের মননে কলেজে এসে তা আরও পরিপক্কতা পায় ভাষাবিজ্ঞানী ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সংস্পর্শে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠ চুকিয়ে যুবক গাজীউল ভর্তি হন প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে থাকতেন। স্নাতক শেষ করে ১৯৫১ সালে ভর্তি হন স্নাতকোত্তরে। বলা প্রয়োজন এর আগেই সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে নেমে পড়েন তিনি। নাম লেখান বাম দলে। ১৯৪৪ সালে বঙ্গীয় মুসলিম ছাত্রলীগ বগুড়া জেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদক হন। একই বছর কুষ্টিয়ার নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের কনফারেন্সে যোগ দেন। গাজীউল হক ছিলেন রাজপথের অকুতোভয় সৈনিক। রাজনীতিতে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। একাধিকবার করতে হয়েছে কারাবরণ। ১৯৪৯ সালে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায়ও ছিলেন সক্রিয়। সে বছর মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে অংশ নিয়েছিলেন ভুখা মিছিলে।

ভাষা আন্দলোন

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জোরদার হয় ১৯৫০ সালে। দানা বাঁধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। গঠন করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। যার আহ্বায়ক হন আব্দুল মতিন। গাজিউল হকের সক্রিয় ভূমিকা ছিল সে পরিষদে। বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি ১৯৫০ সালের ১১ মার্চ ঘোষণা করে রাষ্ট্রভাষা দিবস। এভাবেই কেটে যায় দুই বছর। ১৯৫২ সালে জিন্নাহর বক্তব্যের মাধ্যমে জোরালো হয় আন্দোলন। সে বছরের ২৬ জানুয়ারি পল্টনের জনসভায় মোহাম্মদ আলী জিন্না ঘোষণা করেন, 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। জিন্নাহ সাহেবের এই মন্তব্যটি যেন আগুনে ঘি ঢেলে দিয়েছিল। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো প্রতিবাদে ফেটে পড়ে ছাত্র সমাজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হলে ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। জানুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোষণা করা হয় ছাত্র ধর্মঘট। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার ছাত্রসভাটি অনুষ্ঠিত হয় গাজিউল হকের সভাপতিত্বে। এরপর ছাত্ররা মিছিল নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ১৯৫২ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস আদালত সর্বত্র জ্বলে ওঠে দ্রোহের আগুন। এদিন সারা ঢাকা ছিল উত্তাল। সকাল ৯টা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জিমনেসিয়াম মাঠের পাশে ঢাকা মেডিকেল কলেজের (তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত) গেটের পাশে ছাত্র-ছাত্রীদের জমায়েত শুরু হতে থাকে। বেলা ১১টার দিকে শুরু হয় ছাত্র সমাবেশ।

গাজীউল হক উপস্থিত ছিলেন সেখানে। আরো ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব, অলি আহাদ, আব্দুল মতিন প্রমুখ। তাদের উপস্থিতিতে শুরু হয় এই সমাবেশ। এদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের গতিবিধি আগে থেকেই লক্ষ্য করছিল শাসকগোষ্ঠী। ২০

ফেব্রুয়ারি জারি করে ১৪৪ ধারা। ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতিকে নস্যাৎ করাই ছিল এই ১৪৪ ধারার উদ্দেশ্য। তবে ছাত্রদের দমিয়ে রাখা যায়নি। একুশে তারিখ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য প্রস্তুতি নেন তারা। ঐদিন ওই সমাবেশের নেতৃস্থানীয় ছিলেন গাজিউল হক। ছাত্র নেতাদের মধ্যে তিনি ও আব্দুল মতিন মত দিয়েছিলেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গে। এ উদ্দেশ্যে ছাত্ররা পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের অন্তর্গত) দিকে যাবার উদ্যোগ নেয়। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানে গমগম করতে থাকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। তাদের বাধা হয়ে দাঁড়ায় প্রশাসন। ছাত্র-জনতার সঙ্গে সংঘর্ষ হয় পুলিশের। এক পর্যায়ে নিরস্ত্র ছাত্রদের তাক করে গুলি করে পুলিশ। ঘটনাস্থলেই আবুল বরকত (ঢাবির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মাস্টার্সের ছাত্র), রফিকউদ্দিন আহমদ ও আব্দুল জব্বার নামের তিন তরুণ মারা যান। পরদিন খবর ছড়ায় পুলিশের গুলিতে গাজিউল হক নিহত হয়েছেন। তার নিজ গ্রাম বগুড়াতেও চলে যায় দুঃসংবাদ। সেখানে স্থানীয়রা আলতাফুন্নেসা মাঠে গাজিউলের গায়েবানা জানাযাও পড়ান। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে কেড়ে নেওয়া হয় তার এমএ ডিগ্রি। তবে শেষমেষ জয় হয়েছিল গাজীউলেরই। সে সময় তার সঙ্গে এমন অবিচারে প্রতিবাদ করেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছাত্র নেতারা। ইশতিয়াক, মোহাম্মদ সুলতান, জিল্লুর রহমান প্রমুখের আন্দোলনের চাপে তা থেকে সরে আসেন ঢাবি কর্তৃপক্ষ। ফিরিয়ে দেয় সনদ।

রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা

আস্তে আস্তে রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন গাজীউল হক। ছিলেন মুসলিম লীগের সক্রিয় কর্মী। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেন বগুড়া থেকে। নিজ এলাকাকে মুসলিম লীগের শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তোলেন। ছিলেন মাওলানা ভাসানীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। কাগমারী সম্মেলনেও সক্রিয় ভূমিকা ছিল তার। গাজিউল হক সে সম্মেলনে আওয়ামী পার্টি গঠনে সর্বাঙ্গীন প্রতিকূলতা প্রতিরোধে কাজ করেছিলেন। এদিকে ৫২র পর দুই বছর কেটে গেলেও

> ১৯২৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার নিচিন্তা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন গাজীউল হক।
>
> ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত গাজীউল হকের ভুলব না ভুলব না ভুলব না এই একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না গানটি গেয়ে শহীদ বেদীতে ফুল দিতে যেত বাঙালি।
>
> ২০০৯ সালের ১৭ জুন সমাপ্তি ঘটে গাজিউল হক অধ্যায়ের। ঐদিন সকালে ঘুমের ভেতরে স্ট্রোক করেন এ ভাষা সৈনিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা।

ফেব্রুয়ারি ২১ তারিখ মেনে নিতে পারছিল না পাকিস্তানি শাসক। দিনটি পালন বন্ধে করা হতো ধরপাকড়। সে একই চিত্র দেখা যায় ১৯৫৪ সালে। আগে থেকেই সজাগ ছিল প্রশাসন। নজর ছিল গাজীউলের দিকে। ১৯ তারিখে চালানো অভিযানে তাকেসহ কয়েকজন নেতাকর্মীকে বগুড়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর প্রায় ২৯ মাসের মতো কারাগারে থাকতে হয় তাকে। শুধু ভাষা আন্দোলন নয়, দেশের বিভিন্ন সংকটে রাস্তায় নেমেছেন তিনি। পরেছেন পুলিশের হাতকড়া। কখনও স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন, কখনও সাংস্কৃতিক ও জাতীয় সংগ্রামে পথে নেমেছেন। ১৯৬৯ সালে ১১ দফা আন্দোলনে ছিলেন সক্রিয়। বিড়ি শ্রমিক ও মজদুরদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ১৯৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৪-র সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনে ছিলেন সোচ্চার।

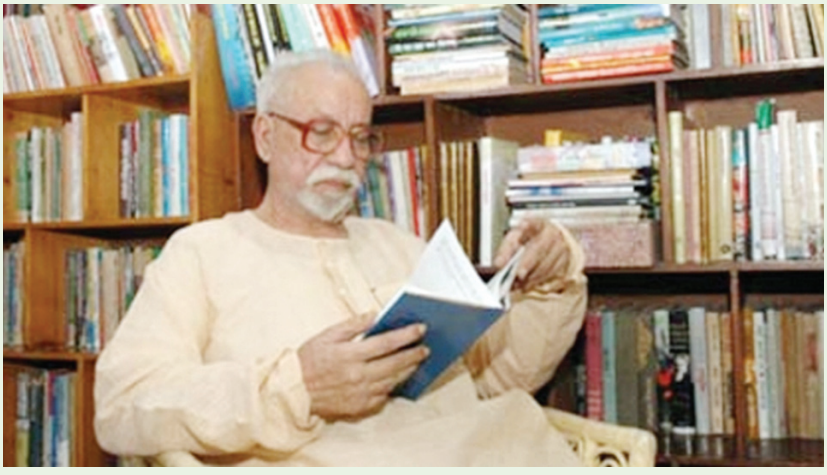

১৯৭১

এক জীবনে শুধু ভাষা আন্দোলনেই সক্রিয় ছিলেন না গাজীউল হক। ১৯৭১ সালে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন। রণাঙ্গনের অকুতোভয় যোদ্ধা ছিলেন তিনি। ২৫ মার্চ রাতেই বেরিয়ে পড়েছিলেন দেশমাতৃকার ডাকে। সঙ্গে নিয়েছিলেন ২৭ জন দেশপ্রেমিক যুবককে। পরে বগুড়া থানার পুলিশ ও ইপিআরের সঙ্গে যোগদান করেন মুক্তিযুদ্ধে। শুধু যোদ্ধা ছিলেন না, ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ভাসানী ও কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দদের নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি হাইকমান্ড গঠন করা হয়। এই পাঁচ জনের একজন ছিলেন গাজীউল।

রণাঙ্গনে দাপিয়ে বেড়ানো গাজীউল হকের একটি যুদ্ধের গল্প শোনা যাক। দিনটি ছিল ১ এপ্রিল। সেদিন ৬০ জন পুলিশের একটি দল নিয়ে হায়নাদের আরিয়া ক্যান্টনমেন্টে হামলা চালান তিনি। বীরত্বের সঙ্গে বন্দি করেন ৬৯ জন পাক সেনা। সঙ্গে ৫৮ ট্রাক গোলাবারুদও জব্দ করেন। পরে কলকাতায় ফিরে গিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধের মুখপাত্র 'জয়বাংলা' পত্রিকার বিক্রয় বিভাগের দায়িত্বসহ আকাশবাণী ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে রণাঙ্গনের সংবাদ প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন।

যুদ্ধ পরবর্তী সময়

যুদ্ধ পরবর্তী সময়েও রাজনৈতিক সচেতন ছিলেন গাজিউল হক। অংশ নিয়েছিলেন স্বৈরাচার (এরশাদ) বিরোধী আন্দোলনে। সৃজনশীল ছিলেন এই বীর যোদ্ধা। একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে গানও রচনা করেছিলেন। সে গান মুখে মুখে ফিরেছে মানুষের। গাফফার চৌধুরীর লেখা আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি গানটির আগে তার গান-ই ব্যবহৃত হতো প্রভাত ফেরিতে। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত গাজীউল হকের 'ভুলব না ভুলব না ভুলব না, এই একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না' গানটি গেয়ে শহীদ বেদীতে ফুল দিতে যেত বাঙালি। বইয়ে তুলে ধরেছেন সংগ্রামের গল্প। এই ভাষা সৈনিক ও একাত্তরের বীরযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধের ওপর লিখেছেন 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' নামের একটি বই। 'উচ্চ আদালতে বাংলা প্রচলন' নামেও বই আছে তার। উচ্চ আদালতে বাংলা প্রচলনের দাবি ছিল তার। ওই জায়গা থেকেই বইটিতে নিজের সংগ্রামের কথা লিখেছিলেন তিনি।

অধ্যায়ের সমাপ্তি

২০০৯ সালের ১৭ জুন সমাপ্তি ঘটে গাজিউল হক অধ্যায়ের। ঐদিন সকালে ঘুমের ভেতরে স্ট্রোক করেন এ ভাষা সৈনিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা। তড়িঘড়ি করে হাসপাতালে নেওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকের শত চেষ্টায়ও ফেরানো যায়নি এ বীর সেনানিকে। জীবনের লেনাদেনা চুকিয়ে পাড়ি জামান পরপারে।